মিউটেশন নিয়ে নয় টেনশন

অনন্ত বিজয়

"What is true for E. coli is true for an elephant."—নোবেল বিজয়ী ফরাসি প্রাণরসায়নবিদ জাক মোনো (Jacques Monod, ১৯১০-১৯৭৬) বিখ্যাত একটি উক্তি। জাক মোনো 'ই. কোলাই' নামক ব্যাকটেরিয়া অণুজীবের সাথে বিশাল আকৃতির হাতির বাহ্যিক চেহারা বা আকৃতিগত কোনো মিলের কথা বলেন নি এখানে, বরং প্রতিটি জীবের আণবিক গঠন-একক এবং জিনেটিক উপাদানের মিলের কথাই বুঝিয়েছেন। যেমন এখন পর্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে উষ্ণ-রক্তের উড়তে সক্ষম পাখির ৯৮০০ প্রজাতি, উষ্ণ-রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীর ৪৮০০ প্রজাতি, উভচর প্রাণীর ৪০০০ প্রজাতি, সরীসৃপ প্রাণীর ৭১৫০ প্রজাতি আবিষ্কার বা শ্রেণীবিন্যাস করা গেছে এবং সবমিলিয়ে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে। মেরুদণ্ডী-অমেরুদণ্ডীসহ অণুজীব সকল প্রজাতি মিলিয়ে জীববিজ্ঞানীরা ধারণা করেন পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ বিলিয়নের মত জীব বসবাস করছে। Homo sapiens (মানুষ) প্রজাতির ছয়শত কোটির অধিক সদস্য রয়েছে। প্রকৃতিতে এত বিশাল সংখ্যক জীবের সমাহার এবং তাদের সবার জীবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'প্রোটিন'-এর গঠন-একক অ্যামিনো অ্যাসিড। এমনিতে প্রকৃতিতে শতাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড (কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, আবার কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা প্রোটিন গঠিত হয় না) পাওয়া গেলেও মাত্র ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডে সকল জীবদেহের প্রোটিন গঠিত। সকল জীবের ডিএনএ অণুর গঠন-একক হচ্ছে নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষার (base)। মাত্র চার ধরনের নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষার [অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G)] দিয়ে জীবের বংশগতির ধারক অণু 'ডিএনএ' গঠিত। যেসকল জীবে ডিএনএ'র বদলে আরএনএ রয়েছে (কিছু কিছু ভাইরাস যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, এইচআইভি, পোলিও ভাইরাস, মাম্পস (mumps), জলাতঙ্ক রোগের rabies ভাইরাস, ইয়েলো ফিভার, ইবোলা ভাইরাস ইত্যাদি), তাদের গঠন-এককের পার্থক্য শুধু একটি ক্ষারে। আরএনএ-তে থাইমিনের (T) বদলে আছে ইউরাসিল (U) নামক ক্ষার। বাকি আরএনএ'র গঠন ডিএনএ'র গঠনের অনুরূপ। জীবদেহে যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় শ্বসনক্রিয়া কিংবা অন্য উপায়ে গৃহীত খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শক্তি (ক্যালরি) সংগ্রহ করে এবং দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জ্য হিসেবে দেহের বাহিরে বের করে দেয়, সামগ্রিক এই প্রক্রিয়াকে বিপাকীয় কার্যক্রম বলে। সকল ইউক্যারিয়ট জীবকোষের বিপাকীয় কার্যক্রম একই রকম। অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, বায়োটিন, রাইবোফ্লেভিন, পাইরিডক্সিন, হিম্‌স, ভিটামিন-K, ভিটামিন-B_{12} ও ফ্যালিক অ্যাসিডের মাধ্যমে জীবকোষের বিপাকক্রিয়া সংঘটিত হয়।

মানুষসহ সকল যৌনজননশীল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র সমরূপ বা অবিকল যমজ (identical twin)[+] ছাড়া ছাড়া অন্য কোন দুটি সতন্ত্র প্রাণির বংশগতি (Genotype) এক নয় এবং দেখতেও হুবহু এক রকম হয় না; মোটামুটি কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক রকম হলেও বেশিরভাগ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা রয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই যেন স্বতন্ত্র স্বত্তা।[+] যৌনপ্রজননশীল সকল জীবের ক্ষেত্রে এই

[+] সাধারণত নারীর একটি ডিম্বাণু পুরুষের একটি শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ভ্রূণাণু গঠন করে। ক্ষেত্রবিশেষে যমজ সন্তানও হয়ে থাকে। যমজ দু ধরনের হয়–একটি সমরূপ বা অবিকল আরেকটি অসমরূপ। অসমরূপ যমজের জন্ম হয় দুটি ডিম্বাণু দুটি শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে। আর যখন নারীর একটি ডিম্বাণু পুরুষের একটি শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ভ্রূণাণু গঠন করে। দ্বিকোষ দশায় কোষদুটি যদি কোনো কারণে পৃথক হয়ে দুটি ভ্রূণ গঠন করে, এর ফলে সমরূপ বা অবিকল যমজ সন্তানের জন্ম হয়। এই ধরনের যমজ সন্তান একই জিনগত নির্দেশাবলী সম্পন্ন হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ আকার, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে অভিন্ন ও একই লিঙ্গের হয়। (দ্রষ্টব্য : পার্থপ্রতিম রায় ও প্রণবকৃষ্ণ চৌধুরী, *সংসদ জীববিজ্ঞান কোষ*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৪)। অবিকল যমজেরা পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত বিরল, প্রতি হাজারে প্রায় চারটি অবিকল যমজ হয়ে থাকে।

[+] একমাত্র সমরূপ বা অবিকল যমজ (identical twin) ব্যক্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তির ফিনোটাইপ অন্য ব্যক্তির সাথে হুবহু এক রকম নয়। তাহলে জিনগত আমাদের মিল কতটুকু? মানব জিনোম প্রকল্প হতে জানা গেছে, আমরা মানুষেরা (*Homo sapiens*) প্রত্যেকে ৩ × ১০^{৯} জোড়া ডিএনএ'র ক্ষার (base) শেয়ার করি। আমরা *Homo sapiens*-দের দুই ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে ৬× ১০^{৬} জোড়া ডিএনএ'র বেসে পার্থক্য রয়েছে। এমনিতে পার্থক্যের সংখ্যাটি অনেক বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু মানব জিনোমের মোট হিসাবে এটি মাত্র ০.১-০.২%; অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের জিনগত মিল প্রায় ৯৯.৯%। ২০০৬ সালে প্রকাশিত আমেরিকার Lawrence Berkeley National Laboratory-এর নিয়ান্ডার্থালদের ফসিল থেকে সংগৃহীত ডিএনএ'র উপর গবেষণা রিপোর্ট হতে জানা যায় আনুমানিক পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হোমো গণের (genus) অন্তর্ভূক্ত প্রজাতি নিয়ান্ডার্থালদের (*Homo neanderthalensis*) সাথে আমাদের (*Homo sapiens*) জিনগত মিল প্রায় ৯৯.৫%। জীবিত নিকট আত্মীয় শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের ডিএনএ'র মিল প্রায় ৯৮%; একটু দূরবর্তী আত্মীয় ওরাংওটাঙের সাথে

শারীরিক-চারিত্রিক বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য (Variation) সত্য। দৈহিক আকার-আকৃতি-আয়তন, গায়ের রঙ, চোখের রঙ, চুলের রঙ, ত্বকের রঙ, ত্বকে লোমের পরিমাণ, চেহারা ইত্যাদি বিষয়ে একই প্রজাতির সকল জীবের মধ্যে বা এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির জীবের মধ্যে সামান্য হলেও পার্থক্য রয়েছে (ব্যতিক্রম অবিকল যমজ)। বংশগতির প্রকাশিত রূপ হচ্ছে জীবের এই যে শারীরিক-চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ, যার মাধ্যমে একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করে চেনা যায়। বংশগতিবিদ্যার ভাষায় এই বৈশিষ্টগুলোকে বলা হয়ে থাকে ট্রেইট (Trait) এবং জীবের একটি স্বতন্ত্র স্বত্তার মধ্যে বংশগতির প্রকাশিত সামগ্রিক রূপকে বলা হয় ফিনোটাইপ (Phenotype)।

জীবজগতের এই বিশাল বৈচিত্র্য-বিভিন্নতা-পার্থক্য উদ্ভবের কারণ নিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই ভেবে এসেছে। অনেকেই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধর্মবাদীরা 'জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা' এড়িয়ে 'ঈশ্বরের মনের খেলা' ধরে নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, ভাববাদী দার্শনিকরা উত্তর খুঁজেছেন উদ্দেশ্যবাদী যুক্তির (Teleological Argument) মধ্যে, বস্তুবাদী দার্শনিকরা খুঁজেছেন দ্বান্দ্বিকতায়; আর বিজ্ঞানীরা, বিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বংশগতি-প্রকরণ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানতেন না। চার্লস ডারউইনও যেখানে জীবজগতের 'বৈচিত্র্য' নামক বাস্তবতাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু তিনিও প্রজন্মান্তরে বংশগতি সঞ্চালনের কারণ এবং প্রকরণ (Variation) উদ্ভবের কারণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছেন। সেকালে ক্ষুদ্র পাওয়ালা ভেড়া-কুকুর, লেজহীন বিড়াল ইত্যাদি ধরনের জীবের প্রকরণকে বলা হত 'স্পোর্ট' (sport)। ডারউইন অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'প্রকরণের বিধি' (Laws of Variation)-তে 'ক্ষুদ্র ভ্রূণ' (gemmule) বলে প্রচলিত একটি ধারণার ব্যাখ্যা দেন এভাবে—'পিতামাতার অঙ্গগুলি থেকে বহু কণিকা রক্তে বাহিত হয় এবং সেখান থেকে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুতে যায় এবং সঙ্গমের সময় তাদের মিলন ঘটে।' বলাবাহুল্য তার এই ধারণা আধুনিক বংশগতিবিদ্যার তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

বংশগতি সঞ্চরণের সূত্র সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন গ্রেগর মেন্ডেল নামের খ্রিস্টান এক পাদ্রি। মটরশুঁটি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল তিনি প্রকাশ করেন 'ব্রুন প্রাকৃতিক ইতিহাস সমিতির সম্পাদিত কর্মবিবরণ' (Transactions of the Brunn Natural History Society) নামক অখ্যাত এক বিজ্ঞান পত্রিকায়।[১] ১৮৬৬ সালে মেন্ডেলের রচনাটি প্রকাশিত হলেও সেই সময়ের জীববিজ্ঞানী বা অন্য কেউ এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ১৯০০ সালে হল্যান্ডের হুগো দ্রাভিস (১৮৪৮-১৯৩৫), জার্মানির কার্ল করেনস (১৮৬৪-১৯৩৩), অস্ট্রিয়ার এরিক সেরম্যাক (১৮৭১-১৯৬২) তিনজনই স্বতন্ত্রভাবে মেন্ডেলের বংশগতি সঞ্চরণের সূত্রগুলি পুনরাবিষ্কার করেন। হুগো দ্রাভিস সর্বপ্রথম স্পোর্টকে 'মিউটেশন' নামে অভিহিত করেন। হল্যান্ডের হ্যালভেরস্ট্রাম-এর নিকটে একটি আলু ক্ষেতে Oenothera lamarckiana প্রজাতির আগাছা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি আগাছার প্রতিটি বংশের গাছের উচ্চতা, আকার, পাতার আকৃতি-আকার, ফুল ও ফলের আকারের যথেচ্ছ বৈচিত্র্যসমূহকে (random variation) ভিত্তি করে 'মিউটেশন' অনুকল্প গড়ে তোলেন। এরপর ১৯০৮ সালে আমেরিকার কোষবিদ গ্যাট্স উদ্ভিদে স্থানান্তরণ (translocation) নামক 'ক্রোমোসোম মিউটেশন' চিহ্নিত করেন। ১৯১০ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক টি এইচ মর্গান এবং মর্গানের ছাত্র এইচ জে মুলার Drosophila melanogaster প্রজাতির ফলের মাছির চোখে জিনেটিক মিউটেশন আবিষ্কার করেন। তারা এক্স-রে প্রয়োগে কৃত্রিমভাবে পুনরায় জিনেটিক মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম হন।[+]

৯৬.৫% এবং নতুন পৃথিবীর বানরের (rhesus) সাথে প্রায় ৯২% এবং ইঁদুরের সাথে বংশগতির দিক থেকে নৈকট্য ৮৫%। অর্থাৎ যে প্রজাতি যত পূর্বে সাধারণ পূবপুরুষ (common ancestor) থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তাদের সাথে আমাদের মানব প্রজাতির জিনগত মিলের পরিমাণ কম।

[১] ম্যান্ডেলের গবেষণা নিয়ে বাংলা ভাষায় কিছু ভাল বই রয়েছে, উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (১) ম. আখতারুজ্জামান, *বংশগতিবিদ্যা*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা; (২) নারায়ন সেন, *ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

[+] প্রজনন-বিজ্ঞানীরা জৈববিবর্তনকে গবেষণাগারে পরীক্ষণের জন্য সাধারণত তিন-চারটি ক্ষণজীবী, ক্ষীণদেহী কিন্তু বহু সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম প্রাণী বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফলের মাছি (*Drosophila melanogaster*)। এই মাছি খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং তার কিছু ফিনোটাইপ বা চারিত্র-লক্ষণ সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। *E. Coli* নামক ব্যাকটেরিয়া মানুষ এবং উচ্চতর স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্ত্রের মধ্যে বাস করে। এদের দেহের গঠন ও ক্রিয়া বোঝা তুলনামূলকভাবে সহজ। ল্যাবরেটরির সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এই ব্যাকটেরিয়াকে সহজেই চাষ করা যায়। Neurospora নামক এক ধরনের ছত্রাক যা পুরানো পচা পাউরুটির গায়ে দেখা যায়। বহু উর্বরা বলে এদেরও সহজে ল্যাবরেটরিতে চাষ করা যায়। ফলের মাছির প্রজন্মকাল দুই সপ্তাহ, ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার প্রজন্মকাল (বাহির থেকে খাদ্য সরবরাহ করলে) প্রায় ১৫-২০ মিনিট। অল্পসময়ে একটি প্রজাতির সকল প্রাণীর মধ্যে কিংবা একটি প্রজাতির একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিউটেশনের প্রভাব, ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব, পরিবর্তিত পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই ইত্যাদি বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য এই জীবদের বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মানুষ (মানুষের এক প্রজন্মকাল ২৫ বছর) কিংবা যেসব জীবের প্রজন্মকাল খুব বেশি এবং সীমিত সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে পারে এমন জীবের উপর স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভবপর নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ক্রোমোসোম মিউটেশনের ন্যায় জিনেটিক মিউটেশন আবিষ্কার হলে ভ্যারিয়েশন উদ্ভবের কারণ যে মিউটেশন এবং ডারউইনের উল্লেখিত 'স্পোর্ট' যে আসলে 'জিন মিউটেশন', সে সম্পর্কে নিশ্চিৎ হওয়া যায়। মিউটেশন নিয়ে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী-গবেষক প্রচুর গবেষণা করেছেন। বংশগতিবিদ্যার বিকাশের সাথে সাথে মিউটেশনের অনেক অজানা তথ্যই আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত। জৈববিবর্তনের সাথে বংশগতির সেতু স্থাপন করেছে এই মিউটেশন।

মিউটেশন বা পরিব্যক্তি জৈববিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে একে জৈববিবর্তনের 'কাঁচামাল' (raw materials) বলে থাকেন। মনে রাখতে হবে জীবের সকল মিউটেশনই জৈববিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবের দেহকোষে যে মিউটেশন হয়, তা জীবের শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা নিষিক্ত ডিম্বতে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না, পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয় না। জৈববিবর্তনকে একটি প্রজাতির সকল প্রাণীর বা ঐ প্রজাতির একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর[+] (population) জিনসম্ভারের (gene pool) পরিবর্তনের নিরিখে বিবেচনা করা হয়। কোনো একক জীবের পরিবর্তনের নিরিখে মোটেও নয়। একক জীবে যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে মিউটেশন বলা হয়। জৈববিবর্তনের অংশ হতে হলে মিউটেশন অবশ্যই জীবের জননকোষে (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা নিষিক্ত ডিম্বতে) ঘটতে হবে, জীবের বংশধরদের (offspring) মধ্যে সঞ্চারিত হতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মিউটেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট ভ্যারিয়েশন এক বংশধর থেকে আরেক বংশধর থেকে ছড়িয়ে পড়বে গোটা জনগোষ্ঠীতে বা প্রজাতিতে। প্রকৃতিতে টিকে থাকবে প্রজন্মে থেকে প্রজন্মে। ডারউইন যাকে বলেছিলেন 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' (Descent with Modification)। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকলে মূল প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' থেকে এক সময় সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। তাই জৈববিবর্তনের মুখ্য একটি শর্ত হলো জীবের জননকোষে মিউটেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট ভ্যারিয়েশন।

'সকল জীবই বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে কিংবা অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে না পারলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'—এমন ধরাবাঁধা নিয়মের কথা জৈববিবর্তন তত্ত্ব কখনো বলে না। কোনো জীবের এক বা একাধিক প্রজাতি বা জনগোষ্ঠী মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে বংশপরম্পরায় টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত না হয়েও। এটিও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'স্থৈতিক নির্বাচন' (stabilizing selection) বলে। যেমন 'জীবন্ত জীবাশ্ম' হিসেবে পরিচিত সিলাকান্থ মাছ, ফুসফুস মাছ, পেরিপেটাস, তুয়াতারা ইত্যাদি প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদের মধ্যে গিংকগো (Ginkgo biloba) প্রভৃতি। এসকল প্রাণীর আদিম শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে বংশপরম্পরায় পৃথিবীতে টিকে রয়েছে। যদিও এদের নিকট-আত্মীয় অন্যান্য প্রজাতি বহুদিন পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু প্রজাতিকে এখন কেবল ফসিল হিসেবেই পাওয়া যায়। আবার 'জৈববিবর্তনের মাধ্যমে জীবের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।'—এমনটাও জৈববিবর্তন তত্ত্ব দাবি করে না। জৈববিবর্তন (প্রাকৃতিক নির্বাচন) জীবকে নিখুঁত বা উৎকৃষ্টরূপে অভিযোজিত করার কোনো প্রক্রিয়া নয়। এটি কোনো সাহায্যকারী হাত কিংবা পৃথিবীর 'অভিকর্ষ বলের' মতো কোনো শক্তি নয়, যে জীবকে পৃথিবীতে টিকে থাকতে বা ধরে রাখতে সহায়তা করবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন অচেতন, উদ্দেশ্যহীন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাহীন প্রক্রিয়া। যদি কোনো জীবের গোটা প্রজাতিতে বা জনগোষ্ঠীতে উপযুক্ত মিউটেশন না ঘটে, ভ্যারিয়েশন উৎপন্ন হতে না পারে, চরম পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে থাকতে অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করতে না পারে তবে ঐ জীবের প্রকৃতিতে অভিযোজন ঘটানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় (এর মানে এই নয় যে, ঐ জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া থেমে যায়)। উদাহরণস্বরূপ Streptococcus নামক ব্যাকটেরিয়ার কথা বলা যায়। এটি শিশুদের টন্‌সিলাইটিস্ রোগসহ মানবদেহের কাঁটাছেড়া অংশ বা ক্ষতস্থান পচনের রোগ সেপটিসিমিয়া, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী। ঐ ব্যাকটেরিয়ার উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা গেছে এদের মধ্যে পরিবর্তিত পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত মিউটেশন না ঘটার কারণে 'ব্যাকটেরিয়া প্রতিষেধক' প্যানিসিলিনের বিপক্ষে খুব সামান্যই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে।

[+] জিনেটিক্সে (বংশগতিবিদ্যায়) জনগোষ্ঠী বা পপুলেশন বলতে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার জনগণকে বোঝায় না। মানে পপুলেশন বলতে একশত বা এক হাজার বা এক লক্ষ সংখ্যার জনগণ হতেই হবে এরকম কিছু নয়। বরং পপুলেশন বলতে বোঝায় যে কোনো সংখ্যার নির্দিষ্ট জনগণ যারা ভৌগলিক, পৃথক বসবাস ও জীবনচর্চার কারণে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু তাদের জিনভাণ্ডার বা জিনসম্ভারে অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে আবার সামান্য কিছু পার্থক্যও থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশে পাহাড়ি আদিবাসীদের সাথে বাঙালির জীবনচর্চা আর পৃথক বসবাসের কিছুটা ভিন্নতা থাকার কারণে একে অপরের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন সাধারণভাবে দেখা যায় না, মানে প্রজনন সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায় জিনগত বিনিময় তেমন একটা হয় না। উক্ত দুটি জনগোষ্ঠী অবশ্যই একই মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাদের উভয়ের জিনভাণ্ডারে প্রচুর মিল রয়েছে, আবার কিছু সংখ্যক পার্থক্য রয়েছে যার ফলে দৈহিক আকৃতি ও চেহারায় ভিন্নতা (সরু চোখ, ভোঁতা নাক, উজ্জ্বল ফর্সা ত্বক ইত্যাদি) দেখা যায়। একই প্রজাতিভুক্ত সকল জীবের কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা, আকার এবং প্রকৃতি একই রকম হয়, তবে ডিএনএ অনুক্রমের বিন্যাসে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। মনে রাখা দরকার পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনগত বিনিময় না হওয়ার কারণ যতটা না ভৌগলিক, তার থেকে বেশি জীবনচর্চার পৃথক পৃথক অবস্থা। (দ্রষ্টব্য : ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, *বংশগতি ও জিনের অসুখ*, ২০০১, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৫)।

ইউক্যারিয়টকোষী জীবে ডিএনএ ক্রোমোসোমের ভিতরে অবস্থিত, আর ক্রোমোসোম নিউক্লিয়াসের ভিতরে। জীবকোষের 'শক্তিঘর' হিসেবে পরিচিত মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর সামান্য কিছু সংখ্যক (নিউক্লিয়াসের ডিএনএ হতে) ভিন্ন ধরনের[+] ডিএনএ পাওয়া যায়; এরা mtDNA নামে পরিচিত। প্রোক্যারিয়টকোষী জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, আর্কিয়ায় (Archaea) নিউক্লিয়াস নেই, বিধায় 'নিরাবরণ' ডিএনএ-কে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায় সাইটোপ্লাজমে; কোনো কোনো প্রোক্যারিয়টকোষী জীবে ডিএনএ'র বদলে পাওয়া যায় শুধু আরএনএ। প্রোক্যারিয়টকোষী জীবের কোষ বিভাজন হয় 'দ্বি-বিভাজন' (binary fission) পদ্ধতিতে। ইউক্যারিয়টকোষী জীবের দেহকোষ বিভাজিত হয় মাইটোসিস পদ্ধতিতে এবং জননকোষ বিভাজিত হয় মাইয়োসিস পদ্ধতিতে। কোষ বিভাজনের সময় কোষের ভিতরকার উপাদানগুলোর রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপিকরণ হয়। ঐ সময় জীবের ক্রোমোসোম অথবা ডিএনএ'র হুবহু প্রতিলিপি তৈরি না হয়ে এদের কোনো কোনো অংশে আকস্মিক, উদ্দেশ্যহীন-পূর্বপরিকল্পনাহীনভাবে অপ্রত্যাশিত এলোমেলো (random)[+] পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে; তাকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বা উৎপরিবর্তন বলে। যখন কোষ বিভাজনের সময় কোনো ক্রোমোসোমের গঠনগত পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ক্রোমোসোমের জিন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, বিন্যাস পরিবর্তন হয়, ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি (পলিপ্লয়েড, অ্যানুপ্লয়েড প্রভৃতি) ঘটে—তাকে ক্রোমোসোম মিউটেশন বলে। ক্রোমোসোম মিউটেশন সাধারণত স্থানান্তরণ, উৎক্রমণ, দ্বৈতকরণ, উৎসারণ, সংমিশ্রণ ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে। খুব সংক্ষেপে এদের সম্পর্কে বলা যায় : স্থানান্তরণ (translocation) এমন ধরনের ক্রোমোসোম মিউটেশন, যেখানে একটি ক্রোমোসোমের ভাঙা অংশ অপর একটি ক্রোমোসোমের (হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে কিংবা হেটারোলোগাস ক্রোমোসোমে হতে পারে) সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সাধারণত কোনো একটি ক্রোমোসোমের একটি বিন্দুতে ভেঙে গেলে এই ধরনের মিউটেশন হয়ে থাকে। এর ফলে ক্রোমোসোমের ভিতরের জিনের বিন্যাস যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি ক্রোমোসোমের আকার-আকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। কোষ বিভাজনের সময় উৎক্রমণ (inversion) মিউটেশন ঘটলে ক্রোমোসোমের অংশবিশেষ ভেঙে গিয়ে ভাঙা অংশ পুরো ১৮০° ঘুরে গিয়ে ঐ ক্রোমোসোমের অন্য অংশের সাথে জোড়া লেগে যায়। জোড়া লাগার ফলে ক্রোমোসোমের ওই অংশের জিনবিন্যাস আগের থেকে বিপরীত হয়ে যায়। দ্বৈতকরণ (duplication) এমন ধরনের ক্রোমোসোম মিউটেশন, যেখানে ত্রুটিপূর্ণ ক্রসিংওভারের ফলে ক্রোমোসোমের ভিতরকার একই জিনবিন্যাস দুইবার করে উপস্থিত হয়। উৎসারণ (deletion) মিউটেশন হচ্ছে এরকম, যেখানে ক্রোমোসোমের অংশবিশেষ ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং ভাঙা অংশটি কোষ বিভাজনের সময় নষ্ট হয়ে যায়। অথবা অপর কোনো ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। আর সংমিশ্রণ (fusion) হচ্ছে এমন ধরনের ক্রোমোসোম মিউটেশন, যেখানে কমপক্ষে দুটি ক্রোমোসোম পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে গিয়ে একটি ক্রোমোসোম গঠিত হয়।

ক্রোমোসোম মিউটেশনের উদাহরণ দেয়া যাক। মোটামুটি সবাই জানি, জৈববিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। মানুষের সাথে এসব প্রাণির শারীরিক গঠনের সাদৃশ্য অনেক বেশি; যেমন মানুষ, শিম্পঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাঙের লেজ নেই। এদের শরীরের কঙ্কালের গঠন মোটামুটি একই। চোখ দুটি মস্তকের সামনের দিকে অবস্থিত। দুই পাশে নয়। মানুষের মত এদের প্রত্যেকের ৩২টি করে দাঁত রয়েছে। মানুষের মত ঠিক সোজা হয়ে

[+] ভিন্ন ধরনের বলা হলো এই কারণে : নিউক্লিয়াসের ডিএনএ'র তুলনায়—মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ'র মিউটেশনের হার প্রায় দশ গুণ বেশি, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ'র নিজেদের মেরামত করার ক্ষমতা দুর্বল, বংশানুসৃতি মেন্ডেলিয়ান পদ্ধতিতে ঘটে না (নিউক্লিয়াসের ডিএনএ'র বংশানুসৃতি মেন্ডেলিয়ান পদ্ধতিতে ঘটে), জিনের সংখ্যা মাত্র ৩৭টি (নিউক্লিয়াসের ডিএনএ-তে প্রায় ত্রিশ হাজার)। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ-তে ক্ষারীয় প্রোটিন 'হিস্টোন' (Histone), অ-প্রোটিন ইন্ট্রন (intron) নেই। নিউক্লিয়াসের ডিএনএ-তে দুটোই আছে। যদিও উভয় ডিএনএ'র উপাদান বা গঠন-একক একই।

[+] ইংরেজি random (এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত) শব্দটি নিয়ে প্রায়শ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। random মানে আসলে কি? অনেকে বলে থাকেন র‍্যান্ডম মানে 'উদ্দেশ্যহীন-পূর্বপরিকল্পনাহীনভাবে যে কোনো কিছু ঘটা।' পুরো ব্যাপারটা আসলে তা নয়। ধরা যাক, 'অনেক লোকই লটারির টিকিট ক্রয় করেছে ('ক' নামের ব্যক্তি বাদে) এবং লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ী লটারির নাম্বারটি র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হলো। এর মানে কি এই, উদ্দেশ্যহীন, পূর্বপরিকল্পনাহীন থাকার কারণে, যে কেউ লটারির টিকিট জিততে পারে? মানে 'ক' ব্যক্তিটি লটারির টিকিট ক্রয় করি নি, তারও কি লটারির টিকিট জেতার কোনো সম্ভাবনা আছে?' স্পষ্টই না। তাহলে এখানে 'র‍্যান্ডম' বলতে কি দাঁড়ালো? সুনির্দিষ্ট সংখ্যক পপুলেশন বা জনগোষ্ঠীর (শুধু যারা লটারির টিকিট ক্রয় করেছে) মধ্য থেকেই কেবল বিজেতা নির্বাচিত হবে; এবং লটারির টিকিট ক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যেকের সমান সম্ভাবনা রয়েছে, যে কারো পুরুষ্কার জেতার। ঠিক তেমনি মিউটেশনকে র‍্যান্ডম বলার অর্থ এই নয় যে, 'যে কোনো ধরনের অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটার সমান সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে মিউটেশনের মাধ্যমে পাখি হয়ে আকাশে উড়াল দিবে কিংবা কোনো ব্যক্তি মাছ হয়ে পানিতে চলে যাবে!)' বরং এটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন-পূর্বপরিকল্পনাহীন জিনেটিক পরিবর্তনের সীমানা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ডিএনএ'র অনুক্রমের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট ডিএনএ অনুক্রমের (sequence) মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবল কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু কি ঘটবে সে সম্পর্কে পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না (unpredictable)।

হাঁটতে না পারলেও একটু কুঁজো হয়ে প্রয়োজনে দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারে এরা। দুই হাতে পাঁচটি করে দশটি আঙুল এবং দুই পায়ে পাঁচটি করে দশটি আঙুল রয়েছে। আঙুলে নখ রয়েছে। মানুষের সাথে এদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্তপ্রবাহনালী, নার্ভ ইত্যাদির পার্থক্য খুবই কম। কিন্তু মানুষের প্রতিটি জননকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ২৩টি, আর শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাঙের প্রতিটি জননকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ২৪টি। (যৌনজননশীল জীবের দেহকোষে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যার ক্রোমোসোম জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে আর জননকোষে (শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে) হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম অবস্থান করে।)। প্রশ্ন দেখা দেয় এরা যদি একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে মানুষের ক্ষেত্রে একটি ক্রোমোসোম কমে গেল কিভাবে? দীর্ঘদিন এ প্রশ্নটি জীববিজ্ঞানীদের ভুগিয়েছে। অবশেষে রহস্যটির সমাধান হয়। ১৯৮২ সালে Science জার্নালে জর্জ ইউনিস এবং ওম প্রকাশ যৌথভাবে 'Origin of Human Chromosome 2: A Chromosomal Pictorial Legacy' শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। গবেষণাপত্রে বলা হয় 'মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাঙের ক্রোমোসোমের গঠনে-আকৃতিতে প্রচুর মিল রয়েছে এবং মিল থাকার কারণে এই ক্রোমোসোমগুলোকে একের পর এক সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেয়া যায়'। পরবর্তীতে মানব জিনোম প্রকল্প থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানা গেছে, শুধুমাত্র ক্রোমোসোমের গঠনে মিল নয়, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের ক্রোমোসোমের মধ্যে অবস্থিত ডিএনএ অনুক্রমের মিল প্রায় ৯৮% এর উপরে। এদের (মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি) ক্রোমোসোমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, মানুষের একটি মাত্র ক্রোমোসোম (ক্রোমোসোম নম্বর ২) বাদে বাকিগুলোর গঠন হুবহু শিম্পাঞ্জির ক্রোমোসোমের গঠনের সাথে মিলে যায়। মানুষের এই ব্যতিক্রম 'ক্রোমোসোম-২' আবার শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাঙের পৃথক দুটি ক্রোমোসোমের (ক্রোমোসোম-২A এবং ক্রোমোসোম-২B) গঠন এবং এই ক্রোমোসোমগুলোর ভিতরের ডিএনএ'র অনুক্রম পরস্পরের সাথে হুবহু মিল খায়। বংশগতিবিজ্ঞানী এবং আণবিক জীববিজ্ঞানীরা ডিএনএ'র অনুক্রম এবং ক্রোমোসোমের গঠনের এই বিশাল সাদৃশ্য থেকে নিশ্চিৎ, যেহেতু শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাঙের জননকোষে ২৪টি ক্রোমোসোম রয়েছে এবং বর্তমানে মানুষের জননকোষে ২৩টি ক্রোমোসোম রয়েছে, তাহলে পূর্বে একসময় বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষেরও জননকোষে ২৪টি ক্রোমোসোম ছিল। একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের কোনো এক পর্যায়ে ক্রোমোসোম মিউটেশন 'সংমিশ্রণ' (Fusion) ঘটার মাধ্যমে ক্রোমোসোম-২A এবং ক্রোমোসোম-২B জোড়া লেগে মানুষের 'ক্রোমোসোম-২' গঠিত হয়। ফলে পূর্বপুরুষের তুলনায় জননকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ২৩টি। মানব শরীরে ক্রোমোসোম মিউটেশনের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ডাউন সিনড্রম (Down Syndrome) বা ট্রাইসোমি ২১ (Trisomy 21)। এটি অবশ্য মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক মিউটেশন। মেয়েদের গর্ভধারণকালে জাইগোট গঠনের সময় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কোষের ভিতরকার উপাদানগুলোর সাথে সাথে ক্রোমোসোমের যে প্রতিলিপি তৈরি হয়, তাতে ২১ নম্বর ক্রোমোসোমে আকস্মিক মিউটেশন 'অবিচ্ছিন্নতা'য় (nondisjunction) এক জোড়ার বদলে অস্বাভাবিকভাবে তিনটি ক্রোমোসোম সংযুক্ত হয়, যাকে 'ট্রাইসোমি ২১' বলে। ফলে ঐ জাইগোট থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সন্তানের প্রতিটি দেহকোষের মোট ক্রোমোসোম সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭টি। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, মেয়েদের অধিক বয়সে গর্ভধারণ করলে সন্তানের ডাউন সিনড্রম ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে[২] এবং এ ধরনের ডাউন সিনড্রম শিশুর মুখমণ্ডল গোলাকার, চোখ মঙ্গোল জাতির মানুষের মতো, করোটি চওড়া ও ছোট, হাত ও পা বেঁটে, হাত ও পায়ের আঙুল ছোট, দেহের মাংসপেশি দুর্বল, অস্বাভাবিক গলার স্বর, হার্টের সমস্যা, বিদীর্ণ তালু-ঠোঁট, থাইরয়েড বা গলগ্রন্থির কার্যক্রমের অক্ষমতা, বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ডাউন সিনড্রোমকে অনেক সময় 'মঙ্গোলিজম' বলা হয়। পাশাপাশি সাধারণ শিশুদের তুলনায় ডাউন সিনড্রম শিশুরা বিভিন্ন ধরনের লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার খুব বেশি। ফলে তাদের গড় আয়ু মানুষের স্বাভাবিক গড় আয়ুর তুলনায় অনেক কম। ডাউন সিনড্রোম বা ক্রোমোসোমের এই অস্বাভাবিকতা শিম্পাঞ্জি বা অন্যান্য প্রাইমেট প্রাণির মধ্যেও দেখা যায়। সাধারণত শিম্পাঞ্জির প্রতিটি দেহকোষে ৪৮টি ক্রোমোসোম জোড়বদ্ধ অবস্থায় থাকে। ডাউন সিনড্রোম শিম্পাঞ্জির প্রতিটি দেহকোষে ক্রোমোসোমের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯টি।

কোনো জিন অথবা ডিএনএ'র শৃঙ্খলে যে নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারের [অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G)] বিন্যাস রয়েছে, তা নতুন করে যুক্ত, বিযুক্ত বা বিন্যস্ত হওয়াকে বলে জিনেটিক মিউটেশন। জিনেটিক মিউটেশনের উদাহরণ পরবর্তীতে দেয়া হবে।

বিভিন্ন কারণেই মিউটেশন ঘটতে পারে, উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে : (১) কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ যদি তার হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে না পারে। জীবের কোষ বিভাজনের সময় প্রাকৃতিকভাবেই এই ঘটনা ঘটে থাকে। নিউ ইয়র্কের কার্নেগি ইনস্টিটিউশনের প্রজননবিদ মিনিস্লাভ ডিমেরেক-এর E. coli ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা থেকে জানা গেছে, প্রাকৃতিকভাবেই মিউটেশনে ঘটে। পরিবেশ সরাসরি কোনো মিউটেশন ঘটায় না। পরিবেশ শুধু বিভিন্ন ধরনের মিউট্যান্ট থেকে উপযুক্ত মিউট্যান্টকে বেছে নেয়। (২)

[২] http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/downsyndrome.cfm।

গবেষণাগারে বাহ্যিক কিছু প্রভাবকের দ্বারা মিউটেশন ঘটানো সম্ভব হয়েছে, যাদের মিউটাজেন বলে। নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বা উচ্চমাত্রার রেডিয়েশনের ফলে অনেক সময় জীবের ডিএনএ'র সিকোয়েন্সে পরিবর্তন আসতে পারে অথবা ডিএনএ'র গঠন ভেঙ্গে যেতে পারে। বিষয়টি অপ্রাকৃত কিছু নয়। ডিএনএ ভেঙ্গে গেলে জীবকোষের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় ডিএনএ মেরামত হয়, কিন্তু পুরোপুরি মেরামত হয় না বা ভেঙ্গে যাওয়া ডিএনএ'কে হুবহু পূর্বের মত হয় না, কিছুটা পরিবর্তন থাকে। ডিএনএ সিকোয়েন্স বা ডিএনএ'র গঠনের এই পরিবর্তনকে জিনেটিক মিউটেশন বলে।

মিউটেশনের অনেকগুলো ধরন বা প্রকার রয়েছে। মিউটেশনের কিছু প্রাথমিক ধরন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক :

(১) প্রতিস্থাপন (Substitution) : ডিএনএ'র মধ্যে যে চারটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার [অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G)] রয়েছে, তারা পরস্পরের সাথে 'পাঁকানো দড়ির মত' (যুগ্ম সর্পিল) হাইড্রোজেন বন্ধনে আবদ্ধ। Substitution এমন ধরনের মিউটেশন যেখানে ডিএনএ'র একটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারের অবস্থানের স্থলে আরেকটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারের বদল হয়।

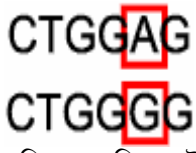

এ ধরনের মিউটেশনের ফলে একটি পৃথক অ্যামিনো অ্যাসিডের উদ্ভব হয়, কিন্তু অনেক সময় প্রোটিনের কাজে খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ সিকল সেল অ্যানেমিয়া নামক এক ধরনের বংশগত রক্তাল্পতা রোগের জন্য দায়ী বিটা-হিমোগ্লোবিন জিনের মিউটেশনটার ধরন হচ্ছে Substitution। এ ক্ষেত্রে বিটা-হিমোগ্লোবিনের জিন-সিকোয়েন্সে একটি মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের মিউটেশনের ফলে অনেক সময় একটি মাত্র কোডনের পরিবর্তন হলেও অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তন হয় না, প্রোটিনের কার্যাবলীতেও পরিবর্তন আসে না। যাকে নীরব (silent) মিউটেশন বলে। আবার একটি মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তন হলে অনেক সময় অসম্পূর্ণ প্রোটিনের উদ্ভব হয়, ফলে প্রোটিনের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

(২) সন্নিবেশন (Insertion) : মিউটেশনের ফলে যদি ডিএনএ'র অনুক্রমের কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে কমপক্ষে অতিরিক্ত এক জোড়া বেস ঢুকে যায় তাকে সন্নিবেশন বা Insertion বলে। নীচের চিত্র থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

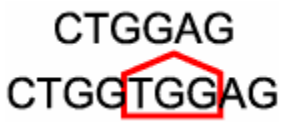

(৩) বিলোপন (Deletion) : নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি কোন ধরনের মিউটেশন। মিউটেশনের ফলে অনেক সময় ডিএনএ'র কোনো অংশ হঠাৎ বিলুপ্ত বা চ্যুত হয়ে যেতে পারে। কমপক্ষে যদি এক জোড়া বেস বা ক্ষার ডিএনএ অনুক্রম থেকে মুছে যায়, তাকে বিলোপন (Deletion) মিউটেশন বলে থাকে।

(৪) ফ্রেমশিফট (Frameshift) : জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রোটিনের সাংকেতিক লিপি হল 'জিন' (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিন ডিএনএ'তে অবস্থিত, কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে আরএনএ'তে); যা জীবের বংশগতির একক। একেকটি 'জিন' একেকটি প্রোটিনের সাংকেতিক লিপি। কয়েকটি 'কোডন' মিলে জিন গঠিত। কোডন হচ্ছে তিনটি নাইট্রোজেনঘটিত জৈবক্ষার (base)-এর মিলিত রূপ; যেমন ACT কিংবা GCA। একেকটি কোডন (উদাহরণস্বরূপ ACT কিংবা GCA) একেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সাংকেতিক লিপি; আবার একাধিক কোডন দ্বারা একই অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হতে পারে। যাহোক, ডিএনএ অনুক্রমে সন্নিবেশন (Insertion) বা বিলোপন (Deletion) ঘটলে কোডনের গঠনে পরিবর্তন আসে, অ্যামিনো

অ্যাসিডের পরিবর্তন হয় এবং এতে জিনের নির্দিষ্ট কার্যক্রমেরও বদল ঘটে। জিনের পরিবর্তন হলে পৃথক প্রোটিনের উদ্ভব হয়। একে ফ্রেমশিফট মিউটেশন বলে।

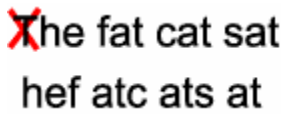

বিষয়টি বোঝার জন্য ইংরেজি একটি বাক্য ধরা যাক : The fat cat sat। মোটামুটি অর্থবোধক এই বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ একেকটি কোডন। এখন যদি আমরা বাক্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর মুছে ফেলি এবং তিনটি অক্ষর মিলিয়ে শব্দগুলি পড়ার চেষ্টা করি, তবে এই বাক্যের আর কোনো অর্থ প্রকাশ পায় না, 'hef atc ats at'। ফ্রেমশিফট মিউটেশন হলে একই ধরনের ঘটনা ঘটে ডিএনএ লেভেলে। কোডনের গঠন পরিবর্তনে জিনের কার্যক্রম অকার্যকর হয়, অর্থহীন হয়ে যায়।[৩]

মিউটেশনের উপরোক্ত ধরনগুলির বাইরেও আরো কিছু ধরনের মিউটেশন রয়েছে, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি বিবেচনায় এখানে থামতে হচ্ছে।

শুধুমাত্র জীবের জননকোষে (শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু বা নিষিক্ত ডিম্বাণুতে) 'মাইয়োসিস' প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের সময় যে মিউটেশন ঘটে থাকে, তাই বংশপরম্পরায় (পরবর্তী প্রজন্মে) প্রবাহিত হয়। মিউটেশন হলে জীবদেহের অ্যামিনো অ্যাসিডের বদল ঘটে এবং এর দ্বারা প্রোটিনের (অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত জটিল জৈবযৌগ) কাজ করার ক্ষমতাও বদল হয়ে যায়। জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা বিশাল। কিছু প্রোটিন জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে সহায়তা করে, যেমন কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, রাইবোজোম, স্নায়ু, পেশিতন্তু ইত্যাদি; কিছু প্রোটিন এনজাইম বা উৎসেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ত এবং রক্তরসেও রয়েছে প্রোটিন যেমন গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, ফাইব্রোজেন। কিছু প্রোটিন আবার হরমোন, যেমন ইনসুলিন। বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধের জন্য শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে প্রোটিন। এছাড়া বিশেষ অবস্থায় (দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে) শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়ায়ও অংশ নিয়ে থাকে প্রোটিন। মিউটেশনের ফলে প্রোটিনের কার্যকারিতা বদল হয়ে গেলে যেমন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াও বদলে যায়, তেমনি কোষ-কলার গঠনেও পরিবর্তন আসে। এভাবে ক্রোমোসোম বা জিনেটিক মিউটেশনের ফলে একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্নতা বা প্রকরণ (ভ্যারিয়েশন) দেখা দেয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো কোনো মিউটেশন অ্যামিনো অ্যাসিডকে ততটা বদলাতে পারে না, তাই প্রোটিনের গঠন বা কাজের ছোটখাটো পরিবর্তন হলেও তেমন বড় ধরনের বদল ঘটে না। আবার অনেক সময় এর বিপরীতটাও ঘটতে পারে। কোনো কোনো মিউটেশন অ্যামিনো অ্যাসিডকে যথেষ্ট পরিমাণ বদলে দিতে পারে, ফলে জীবদেহে প্রোটিনের গঠন এবং কাজের ধরনও অনেকখানি বদলে যেতে পারে। অর্থাৎ ঠিক কতখানি প্রোটিনের কাজ করার ক্ষমতা বদল হল, তা নির্ভর করে মিউটেশনের ফলে কি পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিডের বদল হল, তার উপর। জীবদেহে মিউটেশনকে চিহ্নিত করা যায় ক্রোমোসোম বিশ্লেষণ করে জিনেটিক ম্যাপ তৈরির মাধ্যমে। কোনো প্রাণির ক্রোমোসোম বিশ্লেষণ করে (এবং পূর্বপুরুষদের ক্রোমোসোমের সাথে তুলনা করে) যতবেশি বংশগতির পরিবর্তন চিহ্নিত করা যায় বা পরিমাপ করা যায় জিনেটিক ম্যাপটি ততবেশি অর্থবহ হয়। জিনেটিক ম্যাপের মাধ্যমে যেমন ক্রোমোসোমের অভ্যন্তরের জিনগুলিকে সনাক্ত করা যায়, তেমনি একটি জিন থেকে আরেক জিনের দূরত্ব এবং জিনেটিক লিঙ্কেজ গ্রুপ চিহ্নিত করা যায়। ক্রোমোমোমের ডিএনএ যদি হয় দীর্ঘ রাস্তা তবে বংশগতির এ পরিবর্তনগুলোকে বলা যায় সেই রাস্তার মাইল ফলক কিংবা রাস্তার দিকনির্দেশকারী কোনো চিহ্ন। ফলে এ মাইলফলক বা দিকনির্দেশকারী চিহ্ন থেকে বোঝা যায় কোনো প্রাণির ক্রোমোসোম বা জিনের ঠিক কোথায় এবং কি পরিবর্তনটি (মিউটেশন) হয়েছে।

মিউটেশন বা পরিব্যক্তি নিয়ে একটি প্রচলিত সাবেকী ধারণা হল–'বেশিরভাগ মিউটেশন-ই ক্ষতিকর'। রাশিয়ার কোল্টসোভ ইনস্টিটিউট অব এক্সেপেরিমেন্টাল জিনেটিক্স-এর সাবেক পরিচালক, খ্যাতিমান বংশগতিবিদ সার্গেই এস. চেটভেরিকভ (Sergei S. Chetverikov, ১৮০০-১৯৫৯) তার গবেষণা হতে দেখান 'মিউটেশন যে সবসময়ই ক্ষতিকর'—এমন ধারণা মোটেই সঠিক নয়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থেকে ক্ষতিকর পর্যন্ত বহু ধরনের মিউটেশন রয়েছে।' পরবর্তীতে মিউটেশন নিয়ে আরো আধুনিক গবেষণা হতে জানা গেছে, আসলে বেশিরভাগ মিউটেশন নিরপেক্ষ (neutral) অথবা নিরব (silent)। অনেক সময় মিউটেশনের ফলে ডিএনএ'র সিকোয়েন্স পরিবর্তন হয়, কিন্তু তা অ্যামিনো অ্যাসিডে কোনো প্রভাব ফেলে না, অথবা মিউটেশনের ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডেও

[৩] মিউটেশনের ধরন সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে পাশের ওয়েব সাইট থেকে : http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/IIIC3aTypes.shtml।

পরিবর্তন এলো কিন্তু তা প্রোটিনের সামগ্রিক কাজে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, এ ধরনের নিরব মিউটেশন প্রকৃতিতে প্রায়শই ঘটে থাকে।

মিউটেশন জীবের জন্য ক্ষতিকর না উপকারী, তা অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ জীব যে পরিবেশে বাস করে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যে 'পরিবেশ'কে বিবেচনায় নিয়ে কোন মিউটেশনকে জীবের জন্য 'উপকারী মিউটেশন' বলে মনে হতে পারে, কিছুদিন পরই এই পরিবেশের পরিবর্তন হয়ে গেলে আগের মিউটেশনটাই প্রকৃতিতে জীবের টিকে থাকার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই মিউটেশনকে 'সাধারণীকরণ' করে বলা কিছুটা জটিল বটে। তারপরও কোনো মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো (Variation) যদি জীবকে প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত সুবিধা লাভে সহায়তা করে, তাকে জীববিজ্ঞানীরা 'উপকারী মিউটেশন' হিসেবে অভিহিত করেন আর বিপরীতটা যদি ঘটে (অর্থাৎ এই পরিবর্তনের ফলে এমন হয় যদি জীবদেহে রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে সহজে, কিংবা জীবের প্রকৃতিতে টিকে থাকা দায় হয়ে যায়), তাকে 'ক্ষতিকর মিউটেশন' হিসেবে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ মিউটেশন হচ্ছে, ধরা যাক, কোন শিশুর জন্মের সময় (বাবা-মায়ের শুক্রাণু-ডিম্বাণুর মিলনকালে) মিউটেশনের ফলে বাবা-মার বাদামী বা গাঢ় খয়েরী রঙের চোখ থেকে অনেক হাল্কা রঙের চোখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। যদি ঐ শিশু তার জীবনে এই মিউটেশনের ফলে প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত কোন সুবিধা (দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি) পায় না বা কোন ক্ষতির সম্মুখীন (দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ) হয় না, তাহলে বলতে হবে, ওটা নিরপেক্ষ মিউটেশন ছিল; যা ঐ শিশুর দেহে শুধু একটি ভ্যারিয়েশন তৈরি করেছে।

ইতিবাচক বা উপকারী মিউটেশনের উদাহরণ হতে পারে 'এইচআইভি ভাইরাস'। এইডস রোগীদের জন্য কোন কার্যকরী ঔষধ এখনও তৈরি করা যাচ্ছে না, কারণ এইচআইভি ভাইরাসগুলোতে খুব দ্রুত এবং প্রচুর মিউটেশন ঘটে। ঔষধ প্রয়োগ করলে মিউট্যান্ট ভাইরাসগুলো ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঔষধ আর কার্যকরী হতে পারে না। মানুষের জন্য এই মিউটেশনগুলো ক্ষতিকর মনে হতে পারে কিন্তু যে মিউটেশনগুলোর ফলে এইচআইভি ভাইরাস প্রকৃতিতে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, সে মিউটেশনগুলোকে এইচআইভি ভাইরাসের জন্য 'উপকারী' বলা যায়। আবার অনেক সময় মানবদেহে CCR5 জিনের মিউটেশন এইচআইভি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে; উক্ত জিনেটিক মিউটেশনের ফলে এইচআইভি জীবাণু দেহে কার্যকর হতে পারে না। এটা মানুষের জন্য 'উপকারী' বা 'ইতিবাচক' মিউটেশনের উদাহরণ। আফ্রিকা মহাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল, গ্রিস এবং দক্ষিণ ভারতের ম্যালেরিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া' (sickle cell anemia) নামক রক্তাল্পতার বংশগত রোগটি বহুদিন ধরেই মানবশরীরে ক্রিয়াশীল। এই রোগটা রক্তের লোহিত কোষগুলোকে (red blood cells) আক্রমণ করে। লোহিত কোষের মধ্যে রয়েছে হিমোগ্লোবিন, যার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। হিমোগ্লোবিন (haemoglobin) শব্দের হিম লোহার একটি যৌগের নাম আর গ্লোবিন হল এক ধরনের প্রোটিন। অক্সিজেনযুক্ত অক্সিহিমোগ্লোবিনের জন্য রক্তের রঙ লাল দেখায়। জিনেটিক মিউটেশনের কারণে হিমোগ্লোবিনের প্রোটিনের কার্যকারিতা বদলের ফলে সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগের উদ্ভব। সাধারণ অবস্থায় লোহিত কোষ দেখতে গোলাকার চাকতির মত হলেও সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হলে লোহিত কোষের আকৃতি কাস্তের মত বাঁকা হয়ে যায়। তখন আক্রান্ত কোষ ছোট ছোট রক্তনালীকার মুখে আটকে যায়, অক্সিজেনও শরীরের সব জায়গায় পৌঁছুতে পারে না। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় রক্তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শ্বেত রক্তকোষ (white blood cells) আক্রান্ত লোহিত রক্তকোষগুলোকে এ সময় মারতে শুরু করে। ফলে মানব শরীরে দেখা দেয় রক্তাল্পতা। যে জিনেটিক মিউটেশন 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া' (রক্তাল্পতা) রোগের জন্য দায়ী, মানব শরীরের জন্য তারও অবশ্য একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে : দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রতিরোধে 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া' বহনকারী হিমোগ্লোবিন বেশি কার্যকরী (ফলে ম্যালেরিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে এ রোগটি বেশি দেখা যায়)। অর্থাৎ 'রক্তাল্পতা রোগহীন' ব্যক্তির শরীর ম্যালেরিয়ার জীবাণু বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত-সহায়ক হলেও রক্তাল্পতায় আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। ফলে রক্তাল্পতা রোগহীন ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পরিমাণ রক্তাল্পতায় আক্রান্ত রোগী ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি।

অনেক নারীর দেহে BRCA1 এবং BRCA2 জিন দুটির মিউটেশনের ফলে স্তন ক্যান্সার হয়ে থাকে, যা পরবর্তীতে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ঐ জিন মিউটেশনকে স্বাভাবিকভাবেই 'ক্ষতিকর মিউটেশন' বলা যায়। তাছাড়া CFTR জিনে মিউটেশনের ফলে উদ্ভূত হয় cystic fibrosis (শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুস সংক্রমণের এক ধরনের দূরারোগ্য বংশগত রোগ), হান্টিংটং রোগ (Huntington's Disease), ডায়াবেটিস। এছাড়া বিভিন্ন মানসিক রোগ যেমন সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার (Bipolar mood disorder) রোগের জন্য দায়ী জিনেটিক মিউটেশন; এগুলো 'ক্ষতিকর' মিউটেশনের উদাহরণ।

মিউটেশন নিয়ে আরো একটি প্রচলিত ধারণা হল 'মিউটেশন জীবজগতে খুব দুর্লভ একটি বিষয়।' জীবজগতে প্রাকৃতিকভাবে বড় বড় স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন বেশ ধীরে ঘটলেও, ছোটখাটো মিউটেশন প্রায়ই ঘটে, এগুলো দুর্লভ কোনো ঘটনা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোটখাটো মিউটেশন হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা প্রকৃতি না থাকায় তা প্রকাশিত হয় না। ভাইরাসের উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা যায়, মোটামুটিভাবে ভাইরাসের প্রতি জিনোম রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপিকরণের সময় ০.১ থেকে ১টি মিউটেশন ঘটে থাকে এবং অণুজীবদের ক্ষেত্রে প্রতি জিনোম রেপ্লিকেশনের সময় ০.০০৩ মিউটেশন ঘটে। খুব কম করে হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, মানুষের প্রতি প্রজন্মে মিউটেশনের হার ১.৬। এই হিসাবে নিরপেক্ষ মিউটেশন কিংবা ছোট ছোট মিউটেশন গণনা করা হয় নি। নিরপেক্ষ মিউটেশনসহ গণনা করে দেখা গেছে, শুধুমাত্র মানবভ্রূণেই ৬৪টি নতুন মিউটেশন হয়ে থাকে।[৪] আরেক হিসাবে, মানুষের প্রতি প্রজন্মে মিউটেশন ঘটে ১৭৫টি, এর মধ্যে কমপক্ষে তিনটি ক্ষতিকারক মিউটেশন।[৫]

মিউটেশনের হার স্থির কিছু নয়। প্রাকৃতিকভাবে মিউটেশন ঘটার পাশপাশি কৃত্রিম পদ্ধতিতেও জীবদেহে মিউটেশন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এক্স-রশ্মি, গ্যামা রশ্মি, বিটা রশ্মি, দ্রুতগামী নিউট্রন ও প্রোটন ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত পরিব্যক্তিকর বা mutagen (পরিবর্তন সৃষ্টিকারী পদার্থ)। এছাড়া রয়েছে অতি-বেগুনী রশ্মি, Radio-mimicking নামক রাসায়নিক মিউটাজেন; ডিএনএ ও আরএনএ জাতীয় ভাইরাস যথা স্যানডাই, মিসেল্‌স বা হাম, পীত জ্বর, হার্পিস, সংক্রামক হেপাটাইটিস, পোলিও-মাইয়েলিটিস, এডিনো ভাইরাস, Mycoplasma প্রভৃতি জৈব মিউটাজেন। উপরোক্ত প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ফ্যাক্টর দ্বারা মিউটেশনের হার বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার হলেও এর দ্বারা কোনোভাবেই মিউটেশনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় না। এমন কী, জীবের চাহিদার উপর নির্ভর করেও মিউটেশন হয় না। মিউটেশন নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষণের (উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৫২ সালের Esther এবং Joshua Lederberg-এর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা) মাধ্যমে নিশ্চিৎ হওয়া গেছে মিউটেশন র‍্যান্ডমভাবেই ঘটে, পরিবেশ বা অন্যকিছু দ্বারা নির্দেশিত হয় না। ধরা যাক অতি-বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে কোনো জীবদেহে মিউটেশন হার বৃদ্ধি করা হল, কিন্তু এই মিউটেশনগুলোর ফলে জীবদেহে জীবাণু প্রতিরোধকারী ভাল জিনের উদ্ভব হবে কিনা, কিংবা কোনো ক্ষতিকর জিনের উদ্ভব হবে কিনা, সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা (direction) বা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না (unpredictable)। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়, মিউটেশন অন্ধ, পূর্বপরিকল্পনাহীন-উদ্দেশ্যহীন, র‍্যান্ডম বা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে।

অবশেষে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে জীবজগতে কেন মিউটেশন ঘটে, কেনইবা ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরের সাথে জীবজগতে যৌনতার উদ্ভবের বিষয়টি জড়িত। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে, তবে আপাতত সংক্ষেপে বলা যায়, জীবজগতে মিউটেশন বা ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব একটি নিরেট বাস্তবতা। আমরা জানি, যে কোনো জীবের জনপুঞ্জেই তার বংশগতির তথ্য হুবহু একই রকম প্রতিলিপি তৈরি হয় না। যদি এ রকমটা ঘটে তবে বিবর্তনের দৃষ্টিতে সেই জীবের জনপুঞ্জের বিলুপ্তি তরান্বিত হয়। ডিএনএ'র প্রতিলিপি হুবহু নকল তৈরি করা মানে ঐ জীবের জনপুঞ্জে ভ্যারিয়েশন ঘটবে না; জীবের জনপুঞ্জে যদি ক্ষতিকর বংশগত রোগ বা জীবের টিকে থাকার জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু থেকে থাকে, তবে সেটাও বাহিত হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে। তাদের কেউ কখনও এ ক্ষতিকর উপাদান থেকে মুক্তি পাবে না, সেটা যতই বিধ্বংসী হোক না কেন। এভাবে ঐ জীবের জনপুঞ্জ প্রকারন্তরে পঙ্গু হয়ে যায়। পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে অক্ষম হয়ে যায়, টিকে থাকার লড়াইয়ে তারা কোনো সুবিধা পায় না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালিত বিবর্তন সেই জীবের একটি জনপুঞ্জের টিকে থাকার পক্ষেই যায় যে জীবের জনপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণ ভ্যারিয়েশন রয়েছে, সেই জনপুঞ্জের জীবেরা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে সক্ষম। তার মানে আমরা বলতে পারি 'একটা জিনের অর্থ আসে তার পরিবর্তন থেকে। যেমন একটা চোখের রঙের জিনের দুটো রূপ, কালো চোখ ও নীল চোখ সৃষ্টি করে। পৃথিবীর প্রতিটি লোকের চোখ যদি কালো হয়, যদি সে জিন কিছুতেই না বদলায় তবে নীল চোখের লোক পৃথিবীতে জন্মাবে না, আর আমরাও জানতে পারব না যে সে জিন আসলে চোখের রঙ সৃষ্টি করে। একটা ডিএনএ সিকোয়েন্স অর্থবহ হয় সেই জিনের মিউটেশনের ফলে জীবজগতে সৃষ্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে। পৃথিবীর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাই আসলে সৃষ্টির গূঢ় অর্থ। অভিন্ন, একক জীবন অর্থহীন ও স্থবির। জগতের বৈচিত্র্যের ছোঁয়াতেই জিনোম অর্থবহ হয়।'[৬]

অতিরিক্ত পাঠ :

১) আবেদ চৌধুরী, মানবজিনোম : মানুষের জিন, জিনের মানুষ, ২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

[৪] John W. Drakea, Brian Charlesworthb, Deborah Charlesworthb, and James F. Crowc, Rates of Spontaneous Mutation, Genetics, Vol. 148, 1667-1686, April 1998, http://www.genetics.org/cgi/content/full/148/4/1667

[৫] Michael W. Nachmana and Susan L. Crowella, Estimate of the Mutation Rate per Nucleotide in Humans, Genetics, Vol. 156, 297-304, September 2000, http://www.genetics.org/cgi/content/full/156/1/297

[৬] আবেদ চৌধুরী, *মানব জিনোম : মানুষের জিন, জিনের মানুষ*, ২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৩।

২) দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রাণ ও অপ্রাণের সীমান্তে, ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ।
৩) স্টিভ জোন্স, জীনের লিখন, অনুবাদ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা ।
৪) The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2003). “Are Mutations Harmful?” by Richard Harter, from http://www.talkorigins.org/faqs/mutations.html